গীতা প্রতিটি মানুষেরই ধর্মশাস্ত্র। - মহর্ষি বেদব্যাস

শ্রীকৃষ্ণকালীন মহর্ষি বেদব্যাসের পূর্বে কোন শাস্ত্র লিপিবদ্ধ ছিল না। শ্রুতজ্ঞানের এই পরম্পরা ভঙ্গ করে তিনি চার বেদ, ব্রহ্মসূত্র, মহাভারত, ভাগবত এবং গীতার মত গ্রন্থগুলিতে পূর্বসঞ্চিত ভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানরাশিকে সঙ্কলিত করে শেষে নির্ণয় করলেন যে, '**সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।**' সমস্ত বেদের প্রাণ, উপনিষদ্‌গুলিরও সার হল গীতা, যা গোপাল শ্রীকৃষ্ণ দোহন করে, অশান্ত জীবকে পরমাত্মার দর্শন এবং সাধনের স্থিতি, শাশ্বত শান্তির স্থিতিপর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেন। সেই মহাপুরুষ নিজের গ্রন্থগুলির মধ্যে গীতাকে শাস্ত্রের পরিভাষা দিয়ে স্তুতি করছেন এবং বলেছেন,

গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈ: শাস্ত্রবিস্তরৈ:।

যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনি:সৃতা।।

(ম. ভা., ভীষ্মপর্ব, অ. ৪৩/১)

গীতা উত্তমরূপে মনন করে হৃদয়ে ধারণ করার যোগ্য, যা পদ্মনাভ ভগবানের শ্রীমুখ নি:সৃত বাণী, তাহলে অন্যশাস্ত্র সংগ্রহের কি প্রয়োজন?

গীতার সারাংশ নিম্নপ্রদত্ত শ্লোকটিতে স্পষ্ট হয়–

একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্র গীতম্‌,

একো দেবো দেবকীপুত্র এব।

একো মন্ত্রস্তস্য নামানি যানি,

কর্মাপ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা।।

(গীতা মাহাত্ম্য)

অর্থাৎ একমাত্র শাস্ত্র গীতারই দেবকীপুত্র ভগবান শ্রীমুখে গায়ন করেছেন। প্রাপ্ত করার যোগ্য দেব একজন। সেই গায়নতে যে সত্য সম্বন্ধে বলেছেন, তা হল আত্মা। আত্মা ব্যতীত কিছুই শাশ্বত নয়। সেই গায়নতে মহাযোগেশ্বর কি জপ করতে বলেছেন ? ওঁ। অর্জুন ! ওঁ অক্ষয় পরমাত্মার নাম। ওঁ জপ কর ও ধ্যান আমার স্বরূপের কর। ধর্ম একটাই, গীতায় বর্ণিত পরমদেব একমাত্র পরমাত্মার সেবা। তাঁকে শ্রদ্ধাপূর্বক নিজের হৃদয়ে ধারণ কর। অতএব শুরু থেকেই গীতা আপনার শাস্ত্র। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হাজার হাজার বছর পরে পরবর্তী যে মহাপুরুষগণ একমাত্র ঈশ্বরকে সত্য বলেছেন, তাঁরা গীতারই সংবাদবাহক। ঈশ্বরের কাছ থেকেই লৌকিক ও পারলৌকিক সমস্ত সুখের কামনা, ঈশ্বরকে ভয় পাওয়া, অন্য কাউকে ঈশ্বর না ভাবা–এ পর্যন্ত তো প্রত্যেক মহাপুরুষ বলেছেন; কিন্তু ঈশ্বরীয় সাধনা, ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যায়, এটা কেবল গীতাশাস্ত্রেই ক্রমবদ্ধভাবে সুরক্ষিত। গীতাশাস্ত্র অধ্যয়নে সুখ-শান্তি তো লাভ হয়ই, তার সঙ্গে এই শাস্ত্র অক্ষয় অনাময় পরমপদও প্রদান করে। প্রাপ্তির জন্য অধ্যয়ন করুন গীতার গৌরবপ্রাপ্ত টীকা '**যথার্থ গীতা**'।

যদ্যপি বিশ্বে সর্বত্র গীতা সমাদৃত, তথাপি এই শাস্ত্র কোন ধর্ম অথবা সম্প্রদায়-বিশেষের সাহিত্য হতে পারেনি; কারণ প্রত্যেক সম্প্রদায় কোন না কোন কুরীতিতে জড়িত। ভারতবর্ষে প্রকাশিত গীতাশাস্ত্র বিশ্বের মনীষীদের কাঙ্ক্ষিত গ্রন্থ। গীতাশাস্ত্র আধ্যাত্মিক দেশ ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক গচ্ছিত গ্রন্থ। অতএব এই শাস্ত্রকে রাষ্ট্রীয় শাস্ত্রের সম্মান দিয়ে উঁচু-নীচু, ভেদভাব এবং কলহ-পরম্পরায় পীড়িত বিশ্বের সকল মানুষকে শান্তি প্রদান করার চেষ্টা করুন।

।। ওঁ।।

ধর্ম-সিদ্ধান্ত - এক

১. **সকলেই প্রভুর পুত্র–**

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ।।১৫/৭।।

সকল মানব ঈশ্বরের সন্তান।

২. **মানব দেহের সার্থকতা–**

অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ।।৯/৩৩।।

সুখরহিত, ক্ষণভঙ্গুর কিন্তু দুর্লভ মনুষ্য দেহলাভ করেছ আমার ভজন কর অর্থাৎ ভজনের অধিকার মনুষ্য মাত্রের।

৩. **মানুষের জাতি কেবল দুটি–**

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু ।।১৬/৬।।

দেবস্বভাব ও অসুরস্বভাব এই দুই প্রকার মানুষ সৃষ্ট হয়েছে। যাঁর হৃদয়ে দৈবী সম্পদ্ কার্য করে তিনি দেবতা ও যার হৃদয়ে আসুরী সম্পদ্ কার্য করে সে অসুর। তৃতীয় কোন জাতি সৃষ্টিতে নেই।

৪. **প্রত্যেক কামনা ঈশ্বর থেকে সুলভ–**

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্দিবি দেবভোগান্ ।।৯/২০।।

আমাকে ভজনা করে লোকে স্বর্গপর্যন্ত কামনা করে, আমি তাদের দিয়েও থাকি। অর্থাৎ সবকিছু একমাত্র পরমাত্মা থেকে সুলভ।

৫. ভগবানের শরণদ্বারা পাপনাশ–

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।

সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ।।৪/৩৬।।

সকল পাপী থেকেও অধিক পাপিষ্ঠ জ্ঞানরূপ নৌকাদ্বারা নিঃসন্দেহে উত্তীর্ণ হবে।

৬. জ্ঞান–

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।

এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহন্যথা ।।১৩/১১।।

আত্মার আধিপত্যে আচরণ, তত্ত্বের অর্থরূপ পরমাত্মার (আমার) প্রত্যক্ষ দর্শন জ্ঞান ও এর বিপরীত সমস্তই অজ্ঞান। অতএব ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ অনুভূতিই জ্ঞান।

৭. ভজনের অধিকার সকলেরই–

অপি চেৎসুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।

সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ।। ৯/৩০।।

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।

কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ।।৯/৩১।।

অত্যন্ত দুরাচারীও আমার ভজন করে শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয়ে যায় ও সদা বিরাজমান শাশ্বত শান্তিলাভ করে। অতএব ধর্মাত্মা তিনি, যিনি একমাত্র পরমাত্মার প্রতি সমর্পিত।

৮. ভগবৎপথে বীজের নাশ নেই–

নেহাভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।

স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ।।২/৪০।।

এই আত্মদর্শন ক্রিয়ার অল্পমাত্র আচরণও জন্মমৃত্যুর মহাভয় থেকে উদ্ধার করে।

৯. ঈশ্বরের নিবাস–

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জুন তিষ্ঠতি।

ভ্রাময়ন্সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢানি মায়য়া ।।১৮/৬১।।

ঈশ্বর সকল ভূতপ্রাণীর হৃদয়ে বাস করেন।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।

তৎপ্রসাদাৎপরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ।।১৮/৬২।।

সর্বতোভাবে সেই একমাত্র পরমাত্মার শরণাগত হও। যাঁর কৃপাতে তুমি পরমশান্তি, শাশ্বত পরমধাম লাভ করবে।

১০. যজ্ঞ–

সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে।

আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ।।৪/২৭।।

সকল ইন্দ্রিয়ের কর্ম, মনের চেষ্টা জ্ঞানদ্বারা প্রকাশিত আত্মাতে সংযমরূপ যোগাগ্নিতে আহুতি দেন।

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেহপানং তথাপরে।

প্রাণাপানগতীরুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ।।৪/২৯।।

বহু যোগী অপানবায়ুতে প্রাণবায়ুর আহুতি দেন এবং কোন কোন যোগী প্রাণবায়ুতে অপানবায়ু আহুতি দেন। অবস্থা উন্নত হওয়ার পর অপর প্রাণ এবং অপানবায়ুর গতিরোধ করে প্রাণায়াম পরায়ণ হয়ে যান। এই প্রকার যোগসাধনার বিধি-বিশেষের নাম যজ্ঞ। সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর্ম।

১১. যজ্ঞ করবার অধিকার–

যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।

নায়ং লোকোহস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোহন্যঃ কুরুসত্তম ।।৪/৩১।।

যজ্ঞহীন ব্যক্তি দ্বিতীয়বার মনুষ্যদেহ লাভ করে না অর্থাৎ যজ্ঞ করবার অধিকার তাদের সকলেরই, যারা মনুষ্যদেহ লাভ করেছে।

১২. ঈশ্বর দর্শন সম্ভব–

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোহর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ ।।১১/৫৪।।

অনন্য ভক্তিদ্বারা আমি প্রত্যক্ষ করতে, জানতে এবং প্রবেশের জন্য সুলভ।

আশ্চর্যবৎপশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ।। ২/২৯।।

এই অবিনাশী আত্মাকে কোন বিরল ব্যক্তিই আশ্চর্যের মত দেখেন অর্থাৎ এটাই প্রত্যক্ষ দর্শন।

১৩. আত্মাই সত্য ও সনাতন–

অচ্ছেদ্যোহয়মদাহ্যোহয়মক্লেদ্যোহশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোহয়ং সনাতনঃ ।।২/২৪।।

এই আত্মা সর্বব্যাপক, অচল স্থির এবং সনাতন। আত্মাই সত্য।

১৪. বিধাতা ও তাঁর সৃষ্টি নশ্বর–

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ।। ৮/১৬।।

ব্রহ্মা ও তাঁর নির্মিত সৃষ্টি, দেবতা ও দানব দুঃখের কারণ, ক্ষণভঙ্গুর ও নশ্বর।

১৫. দেবপূজা–

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেহন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ।। ৭/২০।।

কামনাদ্বারা যাদের বুদ্ধি অভিভূত, এরূপ মূঢ়গণই পরমাত্মা ভিন্ন অন্যান্য দেবতার পূজা করে।

যেহপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।

তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ।। ৯/২৩।।

দেবতাদিগের পূজারী আমারই পূজা করে; কিন্তু তা অবিধিপূর্বক সম্পাদিত হয়, তা-ই নষ্ট হয়ে যায়।

শাস্ত্রবিধির ত্যাগ-

অর্জুন! শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাযুক্ত পুরুষগণ দেবতার, রাজসিক পুরুষ যক্ষ-রাক্ষসের এবং তামসিক পুরুষ ভূত-প্রেতের পূজা করে; কিন্তু-

কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।

মাং চৈবান্তঃ শরীরস্থং তান্বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ।। ১৭/৬।।

তারা দেহরূপে স্থিত ভূতসমুদায়কে এবং অন্তর্যামী রূপে স্থিত আমাকে (পরমাত্মাকে) কৃশ করে। এদের তুমি অসুর জানবে অর্থাৎ দেবতাগণের পূজকগণও অসুরবৃত্তির অন্তর্গত।

১৬. অধম—

তানহং দ্বিষত: ক্রূরান্সংসারেষু নরাধমান্।

ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ।।১৬/১৯।।

যারা শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে কল্পিত বিধিদ্বারা যজন অর্থাৎ যজ্ঞ করে, তারা ক্রুরকর্মা, পাপাচারী এবং মনুষ্য মধ্যে অধম। অন্য কেউ অধম নয়।

১৭. নির্ধারিত বিধি কি?

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।

যঃ প্রযাতি ত্যজন্দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ।। ৮/১৩।।

ওঁ যা অক্ষয় ব্রহ্মের পরিচায়ক, এর জপ ও একমাত্র পরমাত্মাকে (আমাকে) স্মরণ, তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের সংরক্ষণে ধ্যান।

১৮. শাস্ত্র–

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।

এতদ্‌বুদ্ধা বুদ্ধিমান্‌স্যাৎকৃতকৃত্যশ্চ ভারত ।। ১৫/২০।।

এইরূপ অতি গোপনীয় শাস্ত্র আমার দ্বারা বলা হল। একথা স্পষ্ট হল যে, শাস্ত্র গীতা।

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ।

জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি ।। ১৬/২৪।।

কর্তব্য-অকর্তব্যের নির্ধারণে শাস্ত্রই প্রমাণ। অতএব গীতার নির্ধারিত বিধিদ্বারা আচরণ করুন।

১৯. ধর্ম–

সর্বধর্মান্‌পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।।১৮/৬৬।।

সকল ধর্মের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করে একমাত্র আমার শরণাগত হও অর্থাৎ একমাত্র ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ সমর্পণই ধর্মের মূলতত্ত্ব, সেই প্রভুকে লাভ করার নির্ধারিত বিধির আচরণই ধর্মাচরণ। (অধ্যায় ২, শ্লোক ৪০)

এবং যে আচরণ করে, সে অত্যন্ত পাপী হলেও শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয়ে যায়। (অধ্যায় ৯, শ্লোক ৩০)

২০. ধর্ম কোত্থেকে লাভ করবেন?–

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।

শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ।।১৪/২৭।।

সেই অবিনাশী ব্রহ্মের, অমৃতের, শাশ্বত ধর্মের এবং অখণ্ড একরস আনন্দের আমিই আশ্রয় অর্থাৎ পরমাত্মস্থিত সদ্‌গুরুই এই সকলের আশ্রয়।

নোট ঃ বিশ্বের সমস্ত ধর্মের সত্যধারা গীতারই প্রসারণ।

।। ওঁ ।।

প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধিপর্যন্ত মনীষীগণ দ্বারা প্রদত্ত কাল-ক্রমানুসারে সন্দেশ

শ্রী পরমহংস আশ্রম জগতানন্দ, গ্রা০-পো০ বরৈনী, কছবা, জেলা-মির্জাপুর (উ০প্র০) নিজের নিবাস অবধিতে স্বামী অড়গড়ানন্দজী প্রবেশ দ্বারের নিকট এই তালিকাটি গঙ্গা দশহরার (১৯৯৩) পবিত্র পর্বে বোর্ডে অঙ্কিত করিয়েছিলেন।

ওঁ

।। বিশ্বগুরু ভারত।।

* **সৃষ্টির আদিশাস্ত্র-**

  'ইমং বিবস্বতে যোগম্' (গীতা ৪/১)– ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, এই অবিনাশী যোগ আমি কল্পের আরম্ভে সূর্যকে বলেছিলাম। সূর্য নিজপুত্র মনুকে বলেছিলেন, যাঁর অনুসারে একমাত্র পরমাত্মাই সত্য, পরমতত্ত্ব; তিনি প্রতিটি রেণুতে ব্যাপ্ত। যোগ-সাধনা দ্বারা সেই পরমাত্মা দর্শন, স্পর্শ এবং প্রবেশের জন্য সুলভ। ভগবান দ্বারা উপদিষ্ট সেই আদিজ্ঞান বৈদিক ঋষিগণ থেকে শুরু করে অদ্যাবধি অক্ষুন্নরূপে প্রবাহিত।

* **বৈদিক ঋষি (অনাদিকাল–নারায়ণ সূক্ত)**

  প্রতিটি অণু পরমাণুতে ব্যাপ্ত ব্রহ্মই সত্য। তাঁকে না জানা পর্যন্ত মুক্তিলাভের আর অন্য কোন উপায় নেই।

* **ভগবান শ্রীরাম (ত্রেতা- লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বে-রামায়ণ)**

  একমাত্র পরমাত্মার ভজন না করে যে কল্যাণকামনা করে সে মূঢ়।

* **যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ (৫২০০ বছর পূর্বে -গীতা)**

  পরমাত্মাই সত্য। চিন্তনের পূর্তিকালে সেই সনাতন ব্রহ্মের প্রাপ্তি সম্ভব। দেবী-দেবতাগণের পূজা মূঢ়বুদ্ধির পরিচয়।

*** মহাত্মা মূসা (৩০০০ বছর পূর্বে-ইহুদী ধর্ম)**

তুমি ঈশ্বরের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা আরোপ না করে তাঁর মূর্ত্তি গড়েছ-সেই জন্য তিনি অসন্তুষ্ট। প্রার্থনা কর।

*** মহাত্মা জরথুস্ত্র (২৭০০ বছর পূর্বে-পারসী ধর্ম)**

অহুরমজ্‌দার (ঈশ্বরের) উপাসনা করে হৃদয়স্থিত বিকারগুলির নাশ কর, এই বিকারগুলিই দুঃখের কারণ।

*** ভগবান মহাবীর (২৬০০ বছর পূর্বে-জৈন গ্রন্থ)**

আত্মাই সত্য। কঠোর তপস্যাদ্বারা তাঁকে এই জন্মেই জানা সম্ভব।

*** গৌতম বুদ্ধ (২৫০০ বছর পূর্বে–মহাপরিনিব্বান সুত্ত)**

আমি সেই অবিনাশী পদলাভ করেছি, যা পূর্ব মনীষীগণ লাভ করেছেন। এটাই মোক্ষ।

*** যীশু খ্রিষ্ট (২০০০ বছর পূর্বে–খৃষ্টান ধর্ম)**

ঈশ্বরকে প্রার্থনা দ্বারা লাভ করা যেতে পারে। আমার অর্থাৎ সদ্‌গুরুর সান্নিধ্যে যাও, তাহলে ঈশ্বরের পুত্র নামে অভিহিত হবে।

*** হজরত মহম্মদ সলল্লাহু০ (১৪০০ বছর পূর্বে–ইসলাম ধর্ম)**

'লা ইলাহ ইল্লল্লাহ মুহম্মদুর রসুলল্লাহ্'–প্রতিটি অণু-পরমাণুতে খোদা (ঈশ্বর) পরিব্যাপ্ত, একমাত্র তিনিই পূজনীয়। মহম্মদ আল্লার সংবাদবাহক।

*** আদি শঙ্করাচার্য (১২০০ বছর পূর্বে)**

জগৎ মিথ্যা, সত্য কেবল হরি ও তাঁর নাম।

*** সন্ত কবীর (৬০০ বছর পূর্বে)**

'রাম নাম অতি দুর্লভ, অওরন তে নহিঁ কাম। আদি মধ্য অওর অন্তহুঁ, রামহিঁ তে সংগ্রাম।।' রামের সঙ্গে সংঘর্ষ কর, তিনিই কল্যাণ করেন।

* **গুরু নানক (৫০০ বছর পূর্বে)**

"এক ওঁকার সতগুরু প্রসাদী।" একমাত্র ওঁকারই সত্য; কিন্তু সেটা সদ্‌গুরুর কৃপাসাপেক্ষ।

* **স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী (২০০ বছর পূর্বে)**

অজর, অমর, অবিনাশী একমাত্র পরমাত্মার উপাসনা কর। সেই ঈশ্বরের মুখ্য নাম ওঁ।

* **স্বামী শ্রী পরমানন্দজী (১৯১১-৬৯ খ্রীঃ)**

ভগবান যখন দয়া করেন, তখন শত্রু মিত্র হয়ে যায়, বিপত্তি সম্পত্তি হয়ে যায়। ভগবান সর্বত্র থেকে দেখেন।

।।ওঁ।।

অনুক্রমণিকা

।। ওঁ ।।

প্রাক্কথন

বস্তুতঃ গীতাশাস্ত্রের উপর টীকা (ভাষ্য, ব্যাখ্যা) লেখার এখন আর কোন প্রয়োজন বলে মনে হয় না, তার কারণ এর উপর শতাধিক টীকা লেখা হয়ে গেছে, সে সকলের মধ্যে পঞ্চাশের উপর কেবল সংস্কৃত ভাষাতেই লিখিত। গীতার বিষয়-বস্তু নিয়ে আনুমানিক পঞ্চাশ মত থাকা সত্ত্বেও সকলেরই আধারশিলা একমাত্র এই গীতা। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কেবল একটি বিষয়, সেই ঈশ্বর-জ্ঞান তত্ত্ব, আত্মজ্ঞান তত্ত্ব সম্বন্ধেই গীতায় উল্লেখ করেছেন, তবে এইরূপ মতভেদ কেন? বস্তুতঃ বক্তা সর্বদা এক নিশ্চিত ভাবকেই ব্যক্ত করেন; কিন্তু শ্রোতা দশজন হলে তাঁরা তাঁদের ভিন্নভিন্ন ধারণা-শক্তির জন্য দশ প্রকারের ভাবার্থ গ্রহণ করে থাকেন। ব্যক্তির বুদ্ধির উপর তামসিক, রাজসিক অথবা সাত্ত্বিক গুণের যতটা প্রভাব থাকে, তিনি সেই স্তর থেকেই বিষয়-বস্তু গ্রহণ করতে পারেন। এর বেশী তিনি গ্রহণ করতে পারেন না। অতএব মতভেদ হওয়াটা স্বাভাবিক।

বিভিন্ন মতবাদের জন্য অথবা কখনও কখনও একটা সিদ্ধান্তকেই ভিন্নভিন্ন কালে ও ভিন্নভিন্ন ভাষাতে ব্যক্ত করা হয়েছে, যার জন্য সাধারণ মানুষ সংশয়ে পড়ে যায়। বহু টীকার মধ্যে সেই সত্যধারাও প্রবাহিত, কিন্তু শুদ্ধ অর্থযুক্ত একখানি টীকা যদি সহস্র টীকার মধ্যে রাখা থাকে, তবে, চেনা দুঃসাধ্য হবে যে, যথার্থ কোনটি? বর্তমানে গীতার অনেক টীকা বাজারে উপলব্ধ এবং প্রত্যেক টীকাকার স্ব স্ব অভিমতদ্বারা সত্যের উদ্‌ঘোষ করে চলেছেন; কিন্তু একথা সত্য যে, গীতার বাস্তবিক অর্থ থেকে তারা প্রায় সকলেই বহুদূরে আছেন। নিঃসন্দেহে কিছু মহাপুরুষ সত্যের স্পর্শ করেছেন, কিন্তু যে কোন কারণে হোক তাঁরা সেটি সমাজের সমক্ষে প্রস্তুত করতে পারেন নি।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশয় হৃদয়ঙ্গম করতে না পারার একমাত্র কারণ তিনি ছিলেন মহাযোগসিদ্ধ পুরুষ। তিনি যে স্তরের বক্তব্য দিয়েছেন ক্রমশঃ চলে সেই স্তরে পৌঁছলেই বলা যেতে পারে যে শ্রীকৃষ্ণ যখন গীতার উপদেশ দিয়েছিলেন,

তখন তাঁর মনোগতভাব কি ছিল? অন্তঃস্থিত সমস্তভাব ভাষায় সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য। তার কিছু অংশ ভাষায় ব্যক্ত হয়, কিছু ভাব-ভঙ্গিমা দ্বারা ও অবশেষ ক্রিয়াত্মক– সাধনা পথের পথিকই সেই নিশ্চিত ক্রিয়াত্মক পদ্ধতিদ্বারা অগ্রসর হওয়ার পর বিষয়-বস্তুর বাস্তবিকতা অনুভব করতে পারেন। যে স্তরে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ পৌঁছেছিলেন, নির্দিষ্ট ক্রিয়াত্মক পদ্ধতির সাহায্যে অগ্রসর হতে হতে সেই পূর্ণ অবস্থা বা স্থিতিপ্রাপ্ত মহাপুরুষই জানতে পারেন যে, আধ্যাত্মিক শাস্ত্র এই গীতা বাস্তবিকে কি বলছে? উক্ত স্থিতিপ্রাপ্ত, যোগযুক্ত মহাপুরুষ কেবল গীতার পঙ্‌ক্তিসমূহই পুনরাবৃত্তি করেন না, বরং তার আভ্যন্তরিক অর্থও বলে দেন; কারণ যে দৃশ্য শ্রীকৃষ্ণের সমক্ষে ছিল, বর্তমানের সেই স্তরের মহাপুরুষের সমক্ষেও সেই দৃশ্যই বিদ্যমান, তাই যা তিনি সম্যক্ দেখছেন, অনুগামীদেরও দেখিয়ে দেবেন এবং হৃদয়াভ্যন্তরে সেই ভাব জাগিয়েও দেবেন ও সুনির্দিষ্ট মঙ্গলময় পথে পরিচালনও করবেন।

'পূজ্য শ্রী পরমহংসজী মহারাজ'ও উক্ত স্তরের মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁর বাণী ও অন্তঃপ্রেরণা দ্বারা গীতার যে শাশ্বত ভাবার্থ প্রাপ্ত হয়েছে, তারই সঙ্কলন এই 'যথার্থ গীতা'। এর মধ্যে স্বীয় কোন অভিমত নেই। এই গীতার সম্পূর্ণ বিষয় ক্রিয়াত্মক। সাধনে প্রবৃত্ত প্রত্যেক পথিককে সেই নিশ্চিত পরিধি অতিক্রম করতে হয়। যতক্ষণ সেই সুনিশ্চিত পথ থেকে সাধক দূরে, ততক্ষণ একথা সত্য এবং স্পষ্ট যে, সে ব্যক্তি সাধনে প্রবৃত্ত নয়, বরং কোন না কোন প্রকার ব্যর্থ ঢোল অবশ্যই পিটিয়ে চলেছে। অতএব কোন মহাপুরুষের আশ্রয় নিন। শ্রীকৃষ্ণ অন্য কোন সত্য বলেননি, বরং বলেছেন, '**ঋষিভির্বহুধা গীতম্**'। ঋষিগণ বহুবার যে কথা বলেছেন, সেই কথাই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন। তিনি একথা কখনও বলেননি যে, "সনাতন-শাশ্বত-সত্য জ্ঞানসম্বন্ধে কেবল আমিই জানি বা আমিই বলব।" বরং বলেছেন, "তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের শরণাগত হও এবং নিষ্কপট সেবা-যত্নদ্বারা সেই জ্ঞানলাভ কর।" শ্রীকৃষ্ণ কেবল মহাপুরুষগণ দ্বারা ঘোষিত শাশ্বত সত্যই উদ্‌ঘাটিত করেছেন।

মূল গীতা সুবোধ্য সংস্কৃতে লিপিবদ্ধ। শুধু এতে নিহিত যথার্থকেই গ্রহণ করেন, তবুও অতি সহজেই আপনাদের সকলের বোধগম্য হবে; কিন্তু আপনারা যেমন আছে ঠিক তেমনিই অর্থ গ্রহণ করেন না। উদাহরণার্থ, শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট বলেছেন–

'যজ্ঞের প্রক্রিয়াই কর্ম।' তবুও আপনারা বলেন কৃষি করা কর্ম। যজ্ঞের অর্থ আগে স্পষ্টই বলেছেন যে– এই যজ্ঞে বহু যোগী প্রাণকে অপানে ও আরও অন্য-অন্য যোগী অপানকে প্রাণে আহুতি দেন, আবার অন্যান্য যোগীগণ প্রাণ-অপান দু-ই রুদ্ধ করে প্রাণায়াম পরায়ণ হয়ে যান, আবার অন্য বহু যোগীগণ ইন্দ্রিয়ের সকল প্রবৃত্তি সংযমাগ্নিতে আহুতি দেন। এই প্রকার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের (প্রাণ-অপানের) চিন্তনকে যজ্ঞ বলে। মনসহিত ইন্দ্রিয়সমূহের সংযমই যজ্ঞ। শাস্ত্রকার এইভাবে যজ্ঞ শব্দের অর্থ স্পষ্ট বলেছেন, তা সত্ত্বেও আপনারা বলেন, "বিষ্ণুর নিমিত্তে স্বাহা বলা, অগ্নিতে যব, তিল ও ঘৃতের আহুতি দেওয়াই যজ্ঞ।" শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ একটা শব্দও কোথাও বলেন নি।

তবে কেন আপনারা বুঝতে পারেন না? সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে বিচার করার পরেও শুধু বাক্য-বিন্যাসই আপনাদের সম্বল হয়, ও আপনারা নিজেদের যথার্থ জ্ঞান থেকে শূণ্যই পান কেন? বস্তুতঃ জন্ম নেওয়ার পর বড় হয়ে মানুষ পৈতৃক সম্পত্তির অর্থাৎ ঘর, দোকান, জমি-জায়গা, পদ-প্রতিষ্ঠা, গরু-মহিষ, যন্ত্র-উপকরণ ইত্যাদির অধিকারী হয়। ঠিক এইভাবে কিছু কুরীতি, পরম্পরা, পূজা-পদ্ধতিও পৈতৃক সম্পত্তির সঙ্গে পেয়ে থাকে। তেত্রিশ কোটি দেবী-দেবতা তো বহু পূর্বেই গোনা হয়েছিল, সমস্ত বিশ্বে এদের অগণিত রূপ নাম। শিশু যেমন যেমন বড় হয়, তেমন তেমন মাতা-পিতা, ভাই-বোন, পাড়া-প্রতিবেশীদের এই দেবী-দেবতারই পূজা করতে দেখে। পরিবারে প্রচলিত নানান পূজা-পদ্ধতির গভীর প্রভাব তার মস্তিষ্কে পড়ে। পরিবারে দেবী-পূজার প্রাধান্য থাকলে 'দেবী-দেবী' করেই তার জীবন কাটে, আর যদি ভূত-পূজার প্রাধান্য দেখে, তাহলে 'ভূত-ভূত' করে তার জীবন কাটে। কেউ শিব, কেউ কৃষ্ণ, কেউ আর কিছু ধরেই থাকে, তাদের কিছুতেই ছাড়তে পারে না।

এরূপ ভ্রান্ত মানুষের হাতে যদি গীতার মত কল্যাণকারক গ্রন্থ পড়েও যায়, তবুও তা তার বোধগম্য হবে না। পৈতৃক সম্পত্তি সে কদাচিৎ ছাড়তেও পারে; কিন্তু এই সকল গোঁড়ামী ও ধর্মের বিভিন্ন আচার-ব্যবহার কিছুতেই ছাড়তে পারে না। পৈতৃক সম্পত্তি ছেড়ে আপনি শত-সহস্র কিলোমিটার দূরে চলে যেতে পারেন; কিন্তু মন ও মস্তিষ্কে অঙ্কিত এই গোঁড়া বিচারধারা গুলি সেখানেও সঙ্গেই থাকে।

আপনি আপনার মন ও মস্তিষ্ককে তো আলাদা করে রাখতে পারেন না, অতএব আপনি যথার্থ শাস্ত্রকেও সেই গোঁড়া রীতি-নীতি, মান্যতা ও পূজা-পদ্ধতির অনুরূপই দেখতে চাইবেন। আপনার বিচার-বুদ্ধির অনুরূপ হলে আপনি স্বীকার করবেন, না হলে সে সমস্ত আপনার কাছে মিথ্যা প্রতীত হবে। এই সকল কারণে গীতার রহস্য আপনি বুঝতে পারেন না, রহস্য রহস্য রূপেই থেকে যায়। একে বাস্তবিক পরখ করেন মহাপুরুষ অথবা সদ্গুরু, তিনিই বলতে পারেন গীতাশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ কি বলেছেন? জনসাধারণের পক্ষে এই বিষয় বুদ্ধির অতীত। এরজন্য সহজ উপায় হল, কোন মহাপুরুষের সান্নিধ্যে গিয়ে বিষয় বস্তুর তত্ত্ব সম্যক্রূপে অবগত হওয়া ও এই কথাই যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বার বার উল্লেখ করেছেন।

গীতাশাস্ত্র কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি, জাতি, মত, পন্থ, দেশকাল বা কোন গোঁড়া সম্প্রদায়ের জন্য নয়। গীতা সার্বলৌকিক, সার্বকালিক ধর্মগ্রন্থ। গীতাগ্রন্থ প্রত্যেক দেশ, প্রত্যেক জাতি এবং প্রত্যেক স্তরের স্ত্রী-পুরুষের জন্য, সকলের জন্য। মানুষ মাত্রের জন্য। কেবল কারও মুখে শুনে অথবা কারও প্রেরণা অথবা প্রভাবে মানুষকে এমন কোন নির্ণয় নেওয়া উচিত নয়, যার প্রভাব তার নিজের অস্তিত্বের উপর প্রত্যক্ষভাবে পড়ে। পূর্বাগ্রহমুক্ত সত্যান্বেষীর জন্য এই আর্যগ্রন্থ আলোক-স্তম্ভ। হিন্দু বর্গের কথন হল– 'বেদই প্রমাণ।' বেদের অর্থ হল জ্ঞান অর্থাৎ পরমাত্মা বোধ। সেই পরমাত্মা না সংস্কৃত ভাষাতে আছে ও না সংহিতায়। পুস্তক তো কেবল তাঁর সঙ্কেত করে। বস্তুতঃ পরমাত্মা হৃদয়ে জাগ্রত হয়।

বিশ্বামিত্র ভগবদ্-চিন্তনে মগ্ন ছিলেন। তাঁর ভক্তিতে প্রসন্ন হয়ে ব্রহ্মা তাঁর কাছে এসে বলেছিলেন– "আজ থেকে তুমি ঋষি।" বিশ্বামিত্র এতে সন্তুষ্ট হন নি, পূর্ববৎ ধ্যানমগ্নই ছিলেন। কিছু কাল পরে দেবতাগণের সঙ্গে ব্রহ্মা পুনরায় এসে বলেছিলেন–"আজ থেকে তুমি রাজর্ষি।" কিন্তু এই বরেও তিনি সন্তুষ্ট হন নি। ধ্যানস্থ ছিলেন। ব্রহ্মা দৈবী সম্পদ্ নিয়ে (দেবতাগণের সঙ্গে) পুনরায় উপস্থিত হয়ে বলেছিলেন– "আজ থেকে তুমি মহর্ষি।" বিশ্বামিত্র বলেছিলেন– "না না, আমাকে জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মর্ষি বলুন।" ব্রহ্মা বলেছিলেন– "এখনও তুমি জিতেন্দ্রিয় হওনি।" বিশ্বামিত্র পুনরায় ধ্যানস্থ হয়েছিলেন। তপপ্রভাবে তাঁর মস্তিষ্ক থেকে প্রচণ্ড তপাগ্নি নিঃসৃত হচ্ছিল। দেবতাদের অনুনয় করাতে তিনি আবার এসে বিশ্বামিত্রকে

বলেছিলেন—“এখন থেকে তুমি ব্রহ্মর্ষি।” তখন বিশ্বামিত্র বলেছিলেন–“যদি আমি ব্রহ্মর্ষি, তবে বেদ আমাকে বরণ করুক।” বেদ বিশ্বামিত্রের হৃদয়ে উদ্ভূত হয়েছিল অর্থাৎ তিনি পূর্ণজ্ঞানী হয়েছিলেন। যে তত্ত্ব জানা ছিল না, তার সম্যক্ জ্ঞান হয়েছিল। বস্তুতঃ বেদ কোন গ্রন্থ নয়, এই জ্ঞানকে বেদ বলে। বিশ্বামিত্র যেখানে থাকতেন, বেদও সেখানে তাঁর সঙ্গে থাকত।

সেই একই কথা শ্রীকৃষ্ণও বলেছেন যে, “সংসার এক অবিনাশী অশ্বত্থ বৃক্ষ। ঊর্ধ্বে পরমাত্মা যার মূল, নিম্নে প্রকৃতিপর্যন্ত এর শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত। যিনি প্রকৃতিকে বিনষ্ট করে পরমাত্মাকে লাভ করেন; তিনিই বেদবিৎ। অর্জুন! আমিও বেদবিৎ।” অতএব প্রকৃতির প্রসার ও বিনাশের সঙ্গে পরমাত্মার অনুভূতিকেই বেদ বলে। হৈ অনুভূতি ঈশ্বরপ্রদত্ত। সেইজন্য বেদকে অপৌরুষেয় বলা হয়। মহাপুরুষগণ অপৌরুষেয় হন। তাঁদের মাধ্যমে পরমাত্মাই কথা বলেন। তাঁরা পরমাত্মার আদেশ-নির্দেশ প্রসারক (ট্রান্সমিটার) হয়ে যান। কেবল শব্দজ্ঞান দ্বারা তাঁদের বাণীর মধ্যে নিহিত যথার্থকে পরখ করা যেতে পারে না। তাঁকে তাঁরাই অনুভব করতে পারেন, যাঁরা সেই নিশ্চিত ক্রিয়াত্মক পথে চলে সেই অপৌরুষেয় স্থিতিলাভ করেন, যাঁর পৌরুষ (অহং) পরমাত্মায় বিলীন হয়ে যায়।

বস্তুতঃ বেদ অপৌরুষেয়; কিন্তু এর বক্তা শ' দেড়শ মহাপুরুষই ছিলেন। তাঁদের বাণীর সংকলনকেই বেদ বলা হয়। কিন্তু যখন কোন শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করা হয়, তখন তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থাও তার নিয়ম-কানুনও সেটিতে লিপিবদ্ধ করা হয়। মহাপুরুষের নামে জনসাধারণ সেই সকল নিয়ম-পালন করতে থাকে, কিন্তু ধর্মের সঙ্গে সে সবের কোন সম্পর্ক নেই। আজকের যুগে মন্ত্রীদের আগে-পিছনে ঘোরে যারা তারাও অধিকারীদের দিয়ে নিজেদের কিছু কিছু কাজ করিয়ে নেয়। যদিও মন্ত্রীরা এই ধরণের নেতাদের চেনে না পর্যন্ত। এই ভাবে সামাজিক ব্যবস্থাকারেরা মহাপুরুষদের নামে নিজেদের সুখসুবিধার রাস্তাও গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। এই সকল ব্যবস্থার সামাজিক উপযোগিতা তৎসাময়িক, বেদের সম্বন্ধেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। চিরন্তন সত্য উপনিষদেই সংগৃহিত। এই সকল উপনিষদের সারাংশই হল যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বাণী 'গীতা'। সারাংশতঃ “গীতা অপৌরুষেয় বেদ-রসার্ণব থেকে সমুদ্ভূত উপনিষদ্-সুধার সার-সর্বস্ব।”

এইরূপ যে মহাপুরুষ যিনি একবার পরমতত্ত্বলাভ করেন, তিনিই ধর্মগ্রন্থস্বরূপ। তাঁর বাণীর সঙ্কলন বিশ্বের যে কোন স্থানেই থাকনা কেন, তা শাস্ত্র নামে অভিহিত হবে। কিছু ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের বক্তব্য এই যে– "কোরানে যা আছে, তা-ই সত্য। পুনরায় কোরান রচনা অসম্ভব।", "যীশুখৃষ্টকে বিশ্বাস না করলে স্বর্গপ্রাপ্তি অসম্ভব, কারন তিনি ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র ছিলেন।", "পুনরায় এই স্তরের মহাপুরুষের আবির্ভাব হওয়া অসম্ভব।"–এই সকল উক্তি গোঁড়ামীর পরিচায়ক। যদি একবার সেই শাশ্বত-সনাতন-সত্য তত্ত্বের সহিত কারও সাক্ষাৎকার হয় তবে পুনরায় তদ্রূপ উৎকৃষ্ট এবং কল্যাণকর বিচার-ব্যবস্থা সম্ভব।

'গীতা' একমাত্র সার্বভৌম ধর্মগ্রন্থ। ধর্মের নামে প্রচলিত বিশ্বের সমস্ত ধর্মগ্রন্থের মধ্যে গীতার স্থান অদ্বিতীয়। গীতা কেবল ধর্মশাস্ত্রই নয়, বরং অন্যান্য যাবতীয় ধর্মগ্রন্থের মধ্যে নিহিত সত্যের মানদণ্ড গীতা। গ্রন্থটির সিদ্ধান্ত ও মর্মকথা এতই মৌলিক যে, অন্য যে কোন ধর্মগ্রন্থে অনুস্যূত সত্য সহজে অনাবৃত হয়ে ওঠে, পরস্পর বিরোধী বিচারসমূহের সমাধান হয়ে যায়। অন্যান্য প্রতিটি ধর্মগ্রন্থে সংসারে সসম্মানে বেঁচে থাকার কলা-কৌশল ও কর্মকাণ্ডের বাহুল্য দেখা যায়। জীবনের স্তর সুন্দর, উন্নত ও আকর্ষক করবার জন্য সেগুলি সম্পাদন করা অথবা না করার রুচিকর ও ভয়ঙ্কর কাহিনীতে পূর্ণ সকল ধর্ম গ্রন্থই। কর্মকাণ্ডের এই পরম্পরাকেই জনসাধারণ ধর্ম বলে মেনে নিয়েছে। জীবন-নির্বাহের কলা-কৌশলের জন্য নির্মিত পূজা-পদ্ধতির মধ্যে দেশকাল ও পরিস্থিতি অনুসারে পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক। ধর্মের নামে সমাজে মতভেদ ও কলহের এটাই একমাত্র কারণ। 'গীতা' এই সমস্ত ক্ষণস্থায়ী ব্যবস্থাগুলির ঊর্দ্ধে আত্মিক পূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত করার ক্রিয়াত্মক অনুশীলন মাত্র, এর একটি শ্লোকও ভৌতিক জীবন-যাপনজন্য নয়। এর প্রতিটি শ্লোক আপনাকে আন্তরিক যুদ্ধ 'আরাধনা'য় প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য আহ্বান করেছে। অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের মত গীতা আপনাদের স্বর্গ অথবা নরকপ্রাপ্তির দ্বন্দ্বে ভ্রান্ত না করে, বরং সেই সনাতন অমরত্বের উপলব্ধি করায়, যারপর আর জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থাকে না।

প্রত্যেক মহাপুরুষ নিজস্ব শৈলী ও কিছু কিছু বিশিষ্ট শব্দের প্রয়োগ করেন। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গীতাশাস্ত্রে 'কর্ম', 'যজ্ঞ', 'বর্ণ', 'বর্ণসঙ্কর', 'যুদ্ধ', 'ক্ষেত্র', 'জ্ঞান'

ইত্যাদি শব্দের উপর বার বার জোর দিয়েছেন। এই সকল শব্দের বিশিষ্ট অর্থও বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ করেছেন। পুনরাবৃত্তিতেও ভাষার শৈলী ও সৌন্দর্য নষ্ট হয়নি। ভাষান্তরের সময় উক্ত শব্দাবলীর যথার্থ অর্থ প্রয়োগের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং আবশ্যক স্থানে উচিত ব্যাখ্যাও করা হয়েছে। নিম্নলিখিত প্রশ্ন গীতার বৈশিষ্ট্য যা অতি আকর্ষক, যার বাস্তবিক অর্থ আধুনিক সমাজ ভুলে যেতে বসেছে। 'যথার্থ গীতা'য় এর বাস্তবিক অর্থ ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। উদাহরণার্থ—

১. **শ্রীকৃষ্ণ**— এক যোগেশ্বর ছিলেন।

২. **সত্য**— আত্মাই একমাত্র সত্য।

৩. **সনাতন**— আত্মাই সনাতন, পরমাত্মাই সনাতন।

৪. **সনাতন ধর্ম**— পরমাত্মার সহিত মিলনের একমাত্র প্রক্রিয়া।

৫. **যুদ্ধ**—দৈবী ও আসুরী গুণসমূহের সংঘষই যুদ্ধ। দৈবী ও আসুরী অন্তঃকরণের দুটি প্রবৃত্তিকে বলে এবং এই দুটি শান্ত হওয়াই পরিণাম।

৬. **যুদ্ধস্থান**— মানবদেহ এবং মনসহিত ইন্দ্রিয়সমূহই যুদ্ধস্থল।

৭. **জ্ঞান**— পরমাত্মার প্রত্যক্ষ অনুভূতিই জ্ঞান।

৮. **যোগ**— সংসারের সংযোগ-বিয়োগরহিত অব্যক্ত ব্রহ্মের সহিত আত্মার মিলনের নামই যোগ।

৯. **জ্ঞানযোগ**— আরাধনাই কর্ম। নিজের উপর নির্ভর হয়ে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়াই জ্ঞানযোগ।

১০. **নিষ্কাম কর্মযোগ**— ইষ্টের উপর নির্ভর করে, সমর্পণের সহিত কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া নিষ্কাম কর্মযোগ।

১১. **শ্রীকৃষ্ণ কোন সত্যের বিষয়ে বলেছেন?**- তত্ত্বদর্শীগণ যা সম্যক্ অনুভব করেছেন ও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে যা দেখেছেন ও এরপরেও দেখবেন, সেই শাশ্বত সত্য সম্বন্ধেই শ্রীকৃষ্ণ গীতায় উল্লেখ করেছেন।

১২. **যজ্ঞ**- সাধনার বিধি-বিশেষকে 'যজ্ঞ' বলে।

১৩. **কর্ম**- যজ্ঞকে কার্যরূপ দেওয়া কর্ম।

১৪. **বর্ণ**- আরাধনার সেই একমাত্র বিধি, যাকে কর্ম বলে। সেই কর্মকে চারটি শ্রেণীতে বিভাগ করা হয়েছে, সেই চারটিই বর্ণ। সাধনা-পথে একজন সাধকেরই উঁচু-নীচু স্তর হল সেই বর্ণ। জাতি-বিশেষ নয়, যা বর্তমান সমাজে প্রচলিত।

১৫. **বর্ণসঙ্কর**– পরমাত্ম-পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া, সাধনায় ভ্রম উৎপন্ন হওয়াই বর্ণসঙ্কর।

১৬. **মানুষের শ্রেণী**– অন্তঃকরণের স্বভাবানুসারে মানুষের শ্রেণী দুটি- প্রথমটি দেবতার ও অন্যটি অসুরের। মানুষের জাতি দুটি, যা স্বভাবদ্বারা নির্ধারিত। এই স্বভাবের আবার ক্ষয়-বৃদ্ধিও হয়।

১৭. **দেবতা**– হৃদয়-ক্ষেত্রে পরমদেবের দেবত্ব অর্জন যাদের সাহায্যে করা হয়, সেই গুণসমূহই দেবতা। বাহ্য দেবতার পূজা মূঢ়তার পরিচয়।

১৮. **অবতার**– অবতারের আবির্ভাব পুরুষের হৃদয়ে হয়, বাইরে নয়।

১৯. **বিরাট দর্শন**– যোগীর হৃদয়ে ঈশ্বরপ্রদত্ত অনুভূতি। ভগবান সাধকের হৃদয়ে দৃষ্টি হয়ে দাঁড়ালে তবেই দেখা যাবে।

২০. **পূজনীয় দেব (ইষ্ট)**– একমাত্র পরাৎপর ব্রহ্মই 'পূজনীয় দেব'। হৃদয়-দেশই হল তাঁকে খুঁজবার স্থান। অব্যক্ত স্বরূপে স্থিত, প্রাপ্তিযুক্ত মহাপুরুষই পরাৎপর পরব্রহ্ম প্রাপ্তির একমাত্র স্রোত।

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বোঝার জন্য তৃতীয় অধ্যায়পর্যন্ত অধ্যয়ন আবশ্যক। ত্রয়োদশ অধ্যায়পর্যন্ত অধ্যয়ন করলে স্পষ্ট বুঝতে পারবেন যে শ্রীকৃষ্ণ যোগী ছিলেন। দ্বিতীয় অধ্যায় থেকেই সত্য স্পষ্ট হবে। সনাতন এবং সত্য একে অন্যের পরিপূরক যা দ্বিতীয় অধ্যায় থেকেই স্পষ্ট বুঝতে পারবেন; কিন্তু তবুও এই বিষয় পূর্তিপর্যন্ত যাবে। চতুর্থ অধ্যায় শেষ হতে হতে যুদ্ধ শব্দের অর্থ স্পষ্ট হতে শুরু হবে, একাদশ অধ্যায়পর্যন্ত সংশয় নির্মূল হবে; তবুও এই বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞানের জন্য ষোড়শ অধ্যায়পর্যন্ত অধ্যয়ন করতে হবে। যুদ্ধস্থান বোঝার জন্য ত্রয়োদশ অধ্যায় বার বার অধ্যয়ন করুন।

জ্ঞানের অর্থ চতুর্থ অধ্যায় থেকে স্পষ্ট হবে এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ে স্পষ্ট জানা যাবে যে প্রত্যক্ষ দর্শনকেই জ্ঞান বলে। 'যোগ' শব্দের অর্থ ষষ্ঠ অধ্যায়পর্যন্ত অধ্যয়ন করলে বোঝা যাবে, যদিও অষ্টাদশ অধ্যায়পর্যন্ত যোগের বিভিন্ন অঙ্গের পরিভাষা দেওয়া হয়েছে। 'জ্ঞানযোগ' তৃতীয় অধ্যায় থেকে ষষ্ঠ অধ্যায়পর্যন্ত স্পষ্ট হয়ে যাবে। 'নিষ্কাম কর্মযোগ' দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে শুরু করে পূর্তিপর্যন্ত চর্চা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায় থেকে চতুর্থ অধ্যায়পর্যন্ত অধ্যয়ন করুন, 'যজ্ঞ' স্পষ্ট বুঝতে পারবেন।

কর্মের নামোল্লেখ অধ্যায় ২/৩৯ শ্লোকে প্রথমবার করা হয়েছে। এই শ্লোক থেকে চতুর্থ অধ্যায়পর্যন্ত অধ্যয়ন করলে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, কর্মের অর্থ আরাধনা অথবা ভজন কেন? ষোড়শ অধ্যায় ও সপ্তদশ অধ্যায়ে সত্য বিচার দৃঢ় হবে। তৃতীয় অধ্যায়ে 'বর্ণসঙ্কর' ও চতুর্থ অধ্যায়ে 'অবতার' স্পষ্ট হবে। বর্ণ-ব্যবস্থা বোঝার জন্য অষ্টাদশ অধ্যায়ের অধ্যয়ন আবশ্যক, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়েও যথেষ্ট সঙ্কেত দেওয়া হয়েছে। মানুষের মধ্যে দেবাসুর জাতির পরিচয় ষোড়শ অধ্যায়ে পাবেন। 'বিরাট দর্শন' দশম অধ্যায় ও একাদশ অধ্যায়পর্যন্ত স্পষ্ট হয়ে গেছে। সপ্তম, নবম ও পঞ্চদশ অধ্যায়েও এবিষয়ে যথেষ্ট চর্চা করা হয়েছে। সপ্তম, নবম ও সপ্তদশ অধ্যায়ে বাহ্য দেবতার অস্তিত্বহীনতার স্পষ্ট ব্যাখ্যা করা হয়েছে। হৃদয়-দেশই পরমাত্মার পূজাস্থলী যার জন্য ধ্যান ও নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের (প্রাণ-অপানের) সহিত ইষ্ট-চিন্তন ইত্যাদি ক্রিয়া, যেটা নির্জনে বসে (মন্দিরে-মূর্তির সম্মুখে নয়) অভ্যাস করা হয়, সেটা তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে স্পষ্ট হয়েছে। আর বেশী বিচার-বিবেচনারই বা কি প্রয়োজন, যদি কেবল ষষ্ঠ অধ্যায়পর্যন্তই অধ্যয়ন করেন, তবুও যথার্থ গীতার মূল আশয় আপনাদের বোধগম্য নিশ্চয়ই হবে।

গীতা জীবিকা-সংগ্রামের সাধন নয়, এতে জীবন-সংগ্রামে শাশ্বত বিজয় লাভের ক্রিয়াত্মক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, সেইজন্য গীতাশাস্ত্র যুদ্ধগ্রন্থ, যার সাহায্যে বাস্তবিক বিজয়লাভ করা সম্ভব। গীতোক্ত যুদ্ধ কামান, ঢাল-তরবারি, তীর-ধনুক, গদা, লাঙ্গল-কোদাল ও কাস্তে-হাতুড়ি ইত্যাদি নিয়ে যে সাংসারিক যুদ্ধ করা হয়, তা নয়, এই সাংসারিক যুদ্ধে শাশ্বত বিজয়লাভ হয় না। এটা শুধু সৎ এবং অসৎ প্রবৃত্তি সমূহের সংঘর্ষ। পুরাকালে এই সকলের রূপকাত্মক বর্ণনার পরম্পরা ছিল।

বেদে ইন্দ্র ও বৃত্র, বিদ্যা ও অবিদ্যা, পুরাণে দেবাসুর সংগ্রাম, মহাকাব্যে রাম-রাবণ ও কৌরব-পাণ্ডবের সংঘর্ষকেই গীতায় ধর্মক্ষেত্র-কুরুক্ষেত্র, দৈবী সম্পদ্-আসুরী সম্পদ্, সজাতীয়-বিজাতীয়, সদ্গুণ ও দুর্গুণ সমূহের সংঘর্ষ বলা হয়েছে।

এই সংঘর্ষ যেখানে হয়েছিল সেই স্থান কোথায় ? গীতার ধর্মক্ষেত্র-কুরুক্ষেত্র ভারতের কোন ভূখণ্ড নয়, স্বয়ং গীতাকারের বাণীতে- **"ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।"**- কৌন্তেয় ! এই দেহটাই ক্ষেত্র, এর মধ্যে ভাল-মন্দ কর্মরূপ যে বীজবপন করা হয়, তা সংস্কাররূপে অঙ্কুরিত হতে থাকে। দশটি ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার, পাঁচটি বিকার এবং সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটি গুণের বিকার হল-এই ক্ষেত্রের বিস্তার। প্রকৃতিজাত এই ত্রিগুণদ্বারা অভিভূত হয়ে মানুষ কর্ম করে। মানুষ ক্ষণমাত্রও কর্ম না করে থাকতে পারে না। **"পুনরপি জননম্ পুনরপি মরণম্ পুনরপি জননী জঠরে শয়নম্।"** জন্ম-জন্মান্তর ধরে এই ক্রিয়াই তো চলেছে। এটাই কুরুক্ষেত্র। সদ্গুরুর শরণাগত হয়ে সাধক যখন সাধনার সঠিক পথে চলে পরমধর্ম পরমাত্মার দিকে অগ্রসর হয়, তখন এই ক্ষেত্রই ধর্মক্ষেত্রে পরিণত হয়। তাই এই দেহটাই ক্ষেত্র।

এই শরীরের অন্তরালে অন্তঃকরণের দুটি পুরাতন প্রবৃত্তি বিদ্যমান, সে দুটি হল—দৈবী সম্পদ্ ও আসুরী সম্পদ্। দৈবী সম্পদে আছে পুণ্যরূপ পাণ্ডু এবং কর্তব্যরূপ কুন্তী। পুণ্য জাগ্রত হবার আগে মানুষ কর্তব্য ভেবে যা কিছু করে, নিজের বুদ্ধি অনুসারে সে কর্তব্যই করে; কিন্তু তার দ্বারা কর্তব্য-পালন হয় না—কারণ পুণ্য ছাড়া কর্তব্য কি, তা বোঝা সহজ নয়। কুন্তী পাণ্ডুর সঙ্গে সম্বন্ধ হওয়ার পূর্বে যাকে অর্জন করেছিল, সে ছিল 'কর্ণ'। আজীবন সে কুন্তীর পুত্রদের সঙ্গে যুদ্ধই করেছিল। পাণ্ডবদের দুর্ধর্ষ শত্রু যদি কেউ ছিল, তবে সে ছিল 'কর্ণ'। বিজাতীয় কর্মই 'কর্ণ', আবার এটা বন্ধনের কারণ, যার থেকে পরম্পরাগত গোঁড়ামীর চিত্রণ হয়—পূজা-পদ্ধতি মস্তিষ্ক থেকে মুছে ফেলা যায় না। পুণ্য জাগ্রত হলে ধর্মরূপ যুধিষ্ঠির, অনুরাগরূপ অর্জুন, ভাবরূপ ভীম, নিয়মরূপ নকুল, সৎসঙ্গরূপ সহদেব, সাত্ত্বিকতারূপ সাত্যকি, কায়াতে সামর্থ্যরূপ কাশিরাজ, কর্তব্যদ্বারা জগতে বিজয়রূপ কুন্তীভোজ ইত্যাদি ইষ্টোন্মুখ মানসিক প্রবৃত্তিসমূহের উৎকর্ষ হয়। যারা গণনায় সাত অক্ষৌহিনী। 'অক্ষ' দৃষ্টিকে বলা হয়। সত্যময় দৃষ্টিকোণ দিয়ে যার গঠন হয়, তাকেই

বলে দৈবী সম্পদ্। পরমধর্ম পরমাত্মাপর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয় এই সাতটি সোপান, 'সাতটি ভূমিকা', কোন অন্য গণনা নয়। বস্তুতঃ এই প্রবৃত্তিসমূহ অনন্ত।

অন্যদিকে আছে কুরুক্ষেত্র, যাতে দশটি ইন্দ্রিয় ও একটী মন মিলিত হয়ে সেনার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে এগারো অক্ষৌহিনী। মন ও ইন্দ্রিয়গম্য দৃষ্টিকোণ দিয়ে যার গঠন হয়, তাকে বলে আসুরী সম্পদ্। তার মধ্যে আছে অজ্ঞানরূপ ধৃতরাষ্ট্র, যে সব সত্য জেনেও অন্ধ। তার সহচারিণী গান্ধারী– ইন্দ্রিয়ের আধারযুক্ত প্রবৃত্তি। তার সঙ্গে আছে মোহরূপ 'দুর্যোধন', দুর্বুদ্ধিরূপ দুঃশাসন, বিজাতীয় কর্মরূপ কর্ণ, ভ্রমরূপ ভীষ্ম, দ্বৈতের আচরণরূপ দ্রোণাচার্য, আসক্তিরূপ অশ্বত্থামা, বিকল্পরূপ বিকর্ণ, অপূর্ণ সাধনে কৃপার আচরণরূপ কৃপাচার্য, ও এদের মাঝে জীবরূপ 'বিদুর' আছে, অজ্ঞানের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও তার দৃষ্টি পাণ্ডবদের উপরই ছিল, পুণ্য থেকে প্রবাহিত প্রবৃত্তির উপর ছিল, কারণ আত্মা পরমাত্মারই শুদ্ধ অংশ। এই প্রকার আসুরিক সম্পদ্ও অনন্ত। ক্ষেত্র একটাই এই দেহটা; এর মধ্যে যুদ্ধে ইচ্ছুক প্রবৃত্তি দুটি–একটি প্রকৃতিতে বিশ্বাস এনে দেয়, যার ফলে নীচ-অধম যোনিতে জন্ম হয় ও অন্যটি পরমপুরুষ পরমাত্মাতে বিশ্বাস ও প্রবেশ দেয়। তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের সংরক্ষণে সাধনা করলে ক্রমশঃ দৈবী সম্পদের উৎকর্ষ ও আসুরিক সম্পদের সর্বথা শমন হয়। মনে যখন কোন বিকার থাকে না তখন মন নিরুদ্ধ হয় শেষে এই নিরুদ্ধ মনেরও সম্পূর্ণ রূপে বিলয় হয়। এই অবস্থায় দৈবী সম্পদেরও আর কোন প্রয়োজন থাকে না। বিশ্বরূপ দর্শনের সময় অর্জুন দেখলেন যে কৌরব পক্ষের পরে পাণ্ডব পক্ষের যোদ্ধাও যোগেশ্বরের মুখ-গহ্বরে সমাহিত হচ্ছে। পূর্তিকালে অর্থাৎ সাধনার অন্তিম স্তরে দৈবী সম্পদ্ও বিলয় হয় এবং সনাতন-শাশ্বত-সত্য পরিণাম দৃষ্টিগোচর হয়। এর পরেও যদি মহাপুরুষগণ আচরণ করেন, তবে তা কেবল অনুগামীদের পথ-প্রদর্শনের জন্যই করেন।

জনহিতের জন্য মহাপুরুষগণ সূক্ষ্ম মনোভাব বর্ণনা স্থূলরূপে করেছেন। গীতাগ্রন্থ যদ্যপি ছন্দবদ্ধ এবং ব্যাকরণসম্মত তথাপি এর সকল পাত্র প্রতীকাত্মক, অমূর্ত যোগ্যতার মূর্তরূপ মাত্র। গীতার শুরুতেই ত্রিশ-চল্লিশজন পাত্রের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, যাদের মধ্যে অর্দ্ধেক সজাতীয়, বাকী অর্দ্ধেক বিজাতীয়। কিছু পাণ্ডব পক্ষের ছিল, কিছু কৌরব পক্ষের ছিল। বিশ্বরূপ দর্শনের সময় এদের মধ্যে চার-ছয়

জনের নামই পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে, অন্যথা সম্পূর্ণ গীতায় এই নামগুলির আর কোথাও উল্লেখ নেই। অর্জুন একমাত্র পাত্র, যিনি শুরু থেকে শেষপর্যন্ত যোগেশ্বরের সমক্ষে ছিলেন। সেই অর্জুনও কেবল যোগ্যতার প্রতীক, ব্যক্তি-বিশেষ নয়। গীতার শুরুতে অর্জুন সনাতন কুলধর্মের রক্ষার জন্য ব্যাকুল ছিলেন, কিন্তু যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এটাকে অজ্ঞান বলেছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন—"আত্মাই সনাতন ও এই শরীর বিনাশলীল, সেইজন্য যুদ্ধ কর।" এই আদেশে একথা স্পষ্ট হচ্ছে না যে, অর্জুন কেবল কৌরব পক্ষের যোদ্ধাদেরই বধ করবেন, পাণ্ডবপক্ষেও তো দেহধারীই ছিল। দুই পক্ষেই আত্মীয় স্বজন ছিল। সংস্কারের উপর আধারিত দেহ কি তরবারিদ্বারা খণ্ড-বিখণ্ড করে সমাপ্ত করা সম্ভব? শরীর যখন বিনাশশীল, যার অস্তিত্বই নেই, তবে অর্জুন কে? শ্রীকৃষ্ণ কার রক্ষার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন? তিনি কি কোন শরীরধারীর রক্ষার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন? শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—"যে শরীরের জন্য পরিশ্রম করে, সে পাপিষ্ঠ মূঢ় ব্যক্তি বৃথাই জীবন ধারণ করে।" যদি শ্রীকৃষ্ণ শরীরধারীর রক্ষার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন, তবে তো তিনিও মূঢ় ব্যক্তি, ব্যর্থই জীবন ধারণ করেছেন। বস্তুতঃ অনুরাগই অর্জুন।

অনুরাগীর জন্য মহাপুরুষ সর্বদাই দাঁড়িয়ে থাকেন। অর্জুন শিষ্য ছিলেন ও শ্রীকৃষ্ণ সদ্গুরু ছিলেন। বিনয়াবনত হয়ে তিনি বলেছিলেন যে, ধর্মপথে মুগ্ধচিত্ত আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, যা শ্রেয় (পরম কল্যাণকর) আমাকে সেই উপদেশ দিন। অর্জুন শ্রেয় চেয়েছিলেন, প্রেয় (ভৌতিক পদার্থ) নয়। তা-ই বলেছিলেন— "শুধু বলবেনই না অর্থাৎ কেবল উপদেশই দেবেন না, সেই পথে পরিচালনাও করুন এবং নিজের তত্ত্বাবধানেও রাখুন। আমি আপনার শিষ্য, আপনার শরণাগত।" এইরূপ গীতায় স্থানে-স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অর্জুন আর্ত অধিকারী ও যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সদ্গুরু। অনুরাগীর সঙ্গে সদ্গুরুর সর্বদা থাকেন, তার পথ-প্রদর্শন করেন।

ভাবুকতাবশতঃ যখন কোন ব্যক্তি 'পূজ্য মহারাজজী'র সান্নিধ্যে থাকার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করত, তখন তিনি বলতেন—"যাও, যেখানেই থাক কিছু আসে যায় না, মন থেকে আমার কাছে আস-যাওয়া করবে। প্রাতঃ, সন্ধ্যা রাম, শিব অথবা ওঁ কোন দুই আড়াই অক্ষরের নামজপ করবে ও হৃদয়ে আমার স্বরূপের ধ্যান করবে।

এক মিনিটও যদি স্বরূপ ধরে রাখতে সক্ষম হও, তবে যাকে ভজন বলে তা আমি তোমায় দেব। এর থেকেও বেশী সময় ধ্যানে স্বরূপ ধরে রাখতে পারলে, হৃদয়ে সারথী হয়ে সর্বদা তোমার সঙ্গে থাকব।” এইরূপ যখন মহাপুরুষের স্বরূপ ধ্যান যোগে স্থির হয়, তখন মহাপুরুষ আপনার হাত-পা-নাক-কান ইত্যাদির মত অতি কাছে বাস করেন। আপনি সহস্র কিলোমিটার দূরে থাকুন না কেন, তাঁকে সর্বদাই কাছে পাবেন। মনে কোন বিচার উদয় হওয়ার পূর্বেই তিনি পথ-প্রদর্শন করতে আরম্ভ করবেন। অনুরাগীর হৃদয়-দেশে মহাপুরুষ সর্বদাই একাত্মা হয়ে জাগ্রত থাকেন। অর্জুন অনুরাগের প্রতীক।

গীতার একাদশ অধ্যায়ে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য দেখবার পর অর্জুন নিজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রুটিগুলির জন্য ক্ষমাযাচনা করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ক্ষমা করেছিলেন এবং পুনরায় ভক্তের ইচ্ছানুরূপ সৌম্যরূপ ধারণ করে বলেছিলেন–“অর্জুন! আমার এই স্বরূপ এর পূর্বে কেউ দেখেনি ও ভবিষ্যতেও কেউ দেখবে না।” তবে তো গীতা আমাদের জন্য ব্যর্থ, কারণ উক্ত বিলক্ষণ রূপ দেখার যোগ্যতা একমাত্র অর্জুনের মধ্যেই ছিল। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে সঞ্জয়ও সেই বিশ্বরূপ দেখেছিলেন। এর পূর্বেও তিনি বলেছেন- “বহু যোগী জ্ঞানরূপ তপস্যা দ্বারা পবিত্র হয়ে আমার সাক্ষাৎ স্বরূপ লাভ করেছেন।” তাহলে তিনি বলতে কি চাইছেন? বস্তুতঃ অনুরাগই ‘অর্জুন’ যা আপনার হৃদয়ের ভাব-বিশেষ। অনুরাগবিহীন পুরুষ না কখনও সেই দিব্য স্বরূপ দর্শন করেছে, না ভবিষ্যতে কখনও করবে। **“মিলহিঁ ন রঘুপতি বিনু অনুরাগা। কিয়ে জোগ তপ গ্যান বিরাগা।।”** অতএব অর্জুন প্রতীক মাত্র। যদি প্রতীকরূপে আপনি না মানতে পারেন, তবে গীতাপাঠ ব্যর্থ, গীতা আপনার জন্য নয়, তবে সেই দর্শনের যোগ্যতাও কেবল অর্জুনের মধ্যেই ছিল।

অবশেষে যোগেশ্বর স্বয়ং নির্ণয় করে বলেছেন– “অর্জুন! অনন্যভক্তি ও শ্রদ্ধাদ্বারা আমি এই প্রকার দেখার (যেমন তুমি দেখলে), তত্ত্বসহিত স্পষ্ট জানার ও প্রবেশ করার জন্যও সুলভ।” অনন্য ভক্তি অনুরাগেরই আরেকটি রূপ এবং এটাই অর্জুনেরও স্বরূপ। অর্জুন পথিকের প্রতীক। এইরূপ গীতার সকল পাত্র প্রতীকাত্মক, যথাস্থানে সঙ্কেত দেওয়া হয়েছে।

হতে পারে, হয়তো ছিলেন কোন ঐতিহাসিক কৃষ্ণ ও অর্জুন, বিশ্বযুদ্ধ হয়ে থাকলে থাকতেও পারে, কিন্তু গীতাশাস্ত্রে ভৌতিক যুদ্ধের চিত্রণ নেই। সেই ঐতিহাসিক যুদ্ধের সমক্ষে দাঁড়িয়ে ভয়ভীত হয়েছিলেন কেবল অর্জুন, সেনা নয়। সেনা তো যুদ্ধোন্মাদে মত্ত, কেবল আদেশের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল।

যুদ্ধার্থ অর্জুনের মনকে প্রস্তুত করার জন্যই কি যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সব্যসাচী অর্জুনকে গীতার উপদেশ দিয়েছিলেন? বস্তুতঃ সাধন লিপিবদ্ধ করা যায় না। সবটা পড়ে নেওয়ার পরেও এই পথে চলা বাকী থাকে। সেই প্রেরণাই প্রদান করবে এই 'যথার্থ গীতা'।

শ্রী গুরু পূর্ণিমা
২৪ জুলাই, ১৯৮৩ খৃঃ।

সদ্‌গুরু কৃপাশ্রয়ী, জগদ্‌বন্ধু
স্বামী অড়গড়ানন্দ